একজন দরদী মালির

জীবন কথা

মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহ.

মূল : মাওলানা উবাইদুর রহমান মুরাবিত

অনুবাদ : মাওলানা ইউনুস আবদুল্লাহ

মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহ.

একজন দরদী মালীর জীবনকথা

মূল

মাওলানা উবাইদুর রহমান মুরাবিত

অনুবাদ

মাওলানা ইউনুস আবদুল্লাহ

মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহ. এর সাথে আমার পরিচয়

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় তখন থেকে, যখন মাদারে ইলমীতে কতিপয় তালিবুল ইলম আমাকে বিভিন্ন ইলমী ও তারবিয়াতি মজলিসে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। ঐ সমস্ত মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল, কিছু নির্বাচিত তালিবুল ইলমকে নবাগত জীবনে আধুনিক মতবাদের সাথে পরিচয় করানো এবং এগুলোকে ইসলামের কষ্টি পাথরে যাচাই করানো। মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই এই মজলিসগুলি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভীষণ অভিলাষী ও অগ্রগামী ছিলেন। তার কারণ কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিতেন-...!

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ

তিনি বলতেন: যখন থেকে তাঁর অনুভব করার বয়স হল, তখন থেকেই তিনি নিজের পরিবারের মাঝে জিহাদের চর্চা পেলেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা ইউসুফ রহ. একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একজন ছিলেন। যখন আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু হয়, তখন তিনি নিজেদের দলকে এই জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। (কিন্তু আজকাল দুনিয়ায় যেখানে সকল সম্প্রদায় নিজেদেরকে নতুন শাসনব্যবস্থার অনুগামী করে নিয়েছে, সেখানে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোও নিজেরাই নিজেদের গলায় গোলামীর বেড়ি পড়ে রয়েছে। সুতরাং...) সেখানে তাঁর পিতার দ্বীনি জামাতের অবস্থান ছিল এই যে, তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইনের ভিতরে থেকে রাজনৈতিক, চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য করবে। কিন্তু মরহুম মাওলানা ইউসুফ রহ. তাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারলেন না। সুতরাং তিনি তাঁর সমমনা চিন্তার অধিকারী অন্যান্য নেতারা এই ফায়সালা করেন যে, তাঁরা আলাদাভাবে জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর যখন এই পরিস্থিতির সংবাদ

তাঁর দলের লোকেরা জানতে পারল, তখন তারা তাদের দল থেকে এ সমস্ত নেতাদের বের করে দিল।

অত:পর যখন সময়ের সাথে সাথে জিহাদের দাওয়াত এ পরিমাণ ছড়িয়ে পড়ল যে, তখন এই দ্বীনি জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন অনেক লোক আলাদাভাবে জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে, অন্যদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রও এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা তাদের রাজনৈতিক পলিসি ও স্বার্থের নিমিত্তে পাকিস্তানি বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জিহাদী জামাত গঠন করবে। তখন সেই দ্বীনি জামাতও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজেদের জিহাদী শাখা প্রতিষ্ঠা করল এবং মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের সম্মানিত পিতাকে পুনরায় তাদের দলে যোগদানের জন্য দাওয়াত দিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. জিহাদের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি এই পবিত্র দায়িত্ব আদায়ের নিমিত্তে নিজের মূল্যবান সময়সহ সকল ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তি বিলিয়ে দেন। মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই বলেন যে, তাঁদের জমি-জমা ও গাড়ি ছিল, কিন্তু এগুলোর প্রায় সবগুলিই জিহাদের কাজে ব্যয় করে দেন। আফগানিস্তান গমনে ইচ্ছুক যুবকেরা তাঁদের ঘরে একত্রিত হত, তখন তাঁদের সকল খরচাদি তাঁর সম্মানিত পিতা বহন করতেন। মুজাহিদরা যে শুধু তাঁদের ঘরে একত্রিত হতেন বিষয়টা এমন নয়, বরং তাঁদের পাঠানোর ব্যবস্থাও করতেন। দিনের প্রচন্ড গরম হোক বা অর্ধ রাতের ঠান্ডা হোক সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের সম্মানিতা মাতা মুজাহিদদের খেদমতে লেগে থাকতেন। এটা তাঁদেরই কাজ ছিল বটে! সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের সম্মানিত পিতা শুধু জিহাদের রাস্তায় নিজের জান, মাল কুরবানী দিয়েই ক্রান্ত ছিলেন না বরং নিজের সন্তানাদিকেও এই পথেরই পথিক বানিয়ে ছিলেন। সুতরাং তিনি শৈশবের ছন্দোময় বয়সেই সাঈদুল্লাহ ভাইকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছিলেন এবং বিভিন্ন রাণাঙ্গনে পাঠিয়ে

ছিলেন। এমনিভাবে সাঈদুল্লাহ ভাই শুরু থেকেই জিহাদের ময়দানগুলোর সাথে পরিচিত ছিলেন। আর এই ধারাবাহিকতা নিজ এলাকার প্রসিদ্ধ মাদরাসার দরসে নেযামী থেকে ফারেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত জারি ছিল।

কাশ্মির জিহাদে অংশগ্রহন

মুজাহিদদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আফগান জনগণের কুরবানী ও উম্মাতে মুসলিমার পৃষ্ঠপোষকতার ফলশ্রুতিতে রাশিয়ার পরাজয় হয় এবং আফগানিস্তান জিহাদের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। খেলাফতব্যবস্থা বিলুপ্তির পর উম্মাতে মুসলিমার জন্য জিহাদের ময়দানে এই প্রথম অনেক বড় বিজয় হাসিল হয়। যখন পাকিস্তান ও আমেরিকা নিজ নিজ স্বার্থের ভিত্তিতে জিহাদ থেকে ফায়েদা নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এমতাবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য দুটি সমস্যা ছিল-

এক. আফগানিস্তানের বৃহৎ মুজাহিদীন সৈন্যদল ইসলাম বিজয়ের স্বপ্ন ও জিহাদী প্রশিক্ষণ দুটো বিষয় সাথে নিয়েই এসেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইন-কানুন যেহেতু কুফর ও শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই এখানকার শাসকদের মনে এই সমস্ত মুজাহিদীনের ভীতি চেপে বসল। (পাছে না আবার তাঁরা পাকিস্তান দখল করে বসে।)

দুই. তারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থে-প্রকৃতপক্ষে সেনাপতিদের ও রাজনীতিবিদদের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে কাশ্মির সমস্যার সমাধান করা ছাড়াই ধারাবাহিক এক জখম চলমান রাখার পথ বেছে নিল। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র (বাহ্যিকভাবে) কাশ্মির জিহাদের দরজা খুলল।

যেখানে অন্যান্য জিহাদী গ্রুপও কাশ্মির অভিমুখী হয়েছে, সেখানে মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইও অধিকৃত কাশ্মিরে যান। তিনি আমাকে এক-দুইবার কাশ্মির জিহাদের বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমার এই মোটাদাগের কথাগুলি ছাড়া অন্য

কোন কিছু মনে নেই, যা কমপক্ষে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ লোকেরও জানা থাকে। উদাহরণস্বরুপ: সেখানে প্রবেশের জন্য কতদিন তুষারের পাহাড়ের উপর ধারাবাহিক সফর করতে হয়েছে, অধিকৃত কাশ্মিরের গোপন আস্তানায় অবস্থান, কাশ্মিরের জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক, হিন্দু সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ, আত্মৎসর্গ ও কুরবানীর কাহিনী...!

জিহাদের ব্যাপারে উদ্বেগ

তিনি বলতেন: আমি যখন দ্বাদশ শ্রেণীর তালিবুল ইলম ছিলাম, তখন আমি কাবুল বিজয়ের সু-সংবাদ পাই। কিন্তু কতিপয় মুজাহিদ গ্রুপের মাঝে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে তা বেশী সময় স্থায়ী হয় নাই। পাশাপাশি কাশ্মির জিহাদের সূচনা হয়। তখন পাকিস্তানী সম্প্রদায়ের মাঝে নতুন চেতনা ও আবেগ ছিল।

এ সময়ের মাঝেই সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের কিছু উদ্বেগ দেখা দেয়। কিন্তু তা দূরে বসে নয় বরং জিহাদের ময়দানে থাকা অবস্থাতেই। তাঁর উদ্বেগ ছিল এই যে, যে পরিমাণ কুরবানী যুবকেরা পেশ করছে, এই পরিমাণ তো ফলাফল হাসিল হচ্ছে না! যেন কোন অদৃশ্য শক্তি মুজাহিদদের উদ্দেশ্য পূরণে বাঁধা দিচ্ছে।

এই জন্য কাশ্মির থেকে প্রত্যাবর্তনে তাঁর খুব আফসোস ছিল। এমনকি তিনি শরীয়ত ও জিহাদ নিয়ে নতুন করে পড়া-শুনা করার সংকল্প করেন। এজন্য তিনি নিজ এলাকার এক মসজিদে অধ্যয়নের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দেন। যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়ন করার পরও তিনি কোন ফলাফলে পৌছাঁতে পারছিলেন না। যার কারণে তার সম্মানিত পিতা পরামর্শ দিলেন যে, যদি অধ্যয়নই করতে হয়, তাহলে নিয়মতান্ত্রিক দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখছ না কেন? তখন তিনি পিতার পরামর্শ কবুল করে নিলেন এবং আমার সৌভাগ্য ছিল যে, আমরা দু‘জন একই জামিয়ায় ভর্তি হয়েছিলাম।

যেমনটা আমি উপরে বলে এসেছি যে, তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় জামিয়ার ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত মজলিসে। কিন্তু এখন তাঁর সে জামিয়ায় পড়া-শুনার লক্ষ্য শুধু ঐতিহ্যগত আবেগ থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করা নয় বরং জিহাদের পুরো ব্যাপারটা সমাধান করা উদ্দেশ্য।

তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ

ঐ মজলিসে আমার তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমার অন্তর্দৃষ্টি কম থাকার দরুন তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। তাঁর পিতা একজন আলিম ও মুজাহিদ ছিলেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তিনি একজন সাধারণ ও অক্ষম মানুষের মত ছিলেন। মানুষদের সাথে এমনভাবে মিশতেন যেন তিনি কিছুই না আর যার সাথে মিশছেন তিনিই সবকিছু। সম্মানিত পিতার এসব গুণাবলী তাঁর ছেলে সাঈদুল্লাহও হুবহু পেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তাওফিক দিন, আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং তাঁর সম্মানিত পিতাকে সন্তানদেরকে তারবিয়াত করার উত্তম প্রতিদান দিন।...আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন

জীবনের গতানুগতিক ধারার অধ্যয়নের পর

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে দিয়ে দুই-তিন সপ্তাহব্যাপী এই মজলিসগুলোতে দুনিয়াতে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে খোলাসা করার জন্য শরীয়তের ব্যাপারে প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শীদেরকে দাওয়াত করা হত। পাশাপাশি তালিবুল ইলমদেরকে এ বিষয়বস্তুর উপর লিখিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করার জন্য দেয়া হত। এই সমস্ত মজলিসে অংশগ্রহনের পর আমার ও সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস

হয়ে গিয়েছিল যে, দুনিয়ার মাঝে প্রচলিত আধুনিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। চাই তা গনতন্ত্র হোক বা পুঁজিবাদ হোক অথবা পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার শাসনব্যবস্থা হোক বা অন্য কোন শাসনব্যবস্থা হোক... এই শাসনব্যবস্থা আমাদের নয়। তার আবিস্কারক হল পশ্চিমারা, যারা ঔপনিবেশিক যুগে জোরপূর্বক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এই শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল এবং অদ্য যুগ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন একটি প্রজন্ম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, যারা ঔপনিবেশিক যুগ পার হয়ে যাবার পরেও স্বইচ্ছায় ও আগ্রহের সাথে সেই শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর মুসলিম জনসাধারণ না চাইলেও তারা জোর-জবরদস্তি পূর্বক তা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আরো পাকাপোক্ত হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত পাশ্চাত্যের শাসনব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলে দেয়া না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে না এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাওহীদের সাথে কখনো শিরক একত্রিত হতে পারে না। আধুনিক পশ্চিমা শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী বানানোর জন্য লাখো বার প্রচেষ্টা করা যাবে কিন্তু যে জিনিস মূলগতভাবেই নাপাক, তা ঐ সময় পর্যন্ত পাক হবে না, যতক্ষণ না তার আসল প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা হবে। যখন পশ্চিমা শাসনব্যবস্থা দুনিয়াকে এমনভাবে নিষ্ঠুরতার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছে যে, তার শাসনব্যবস্থার আসল প্রকৃতি কখনোই বদলানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

যদিও এই ফলাফল কোন নতুন বিষয় নয়। এ ব্যাপারে কত সংখ্যক উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাবিদরা যে কথা বলেছেন, তার কোন ইয়াত্তা নেই। কিন্তু আত্মিক প্রশান্তি হাসিল করার নিমিত্তে অন্ততপক্ষে সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের মত তাত্ত্বিক ব্যক্তির জন্য জরুরী ছিল যে, তিনি প্রত্যেক মাসআলার গভীরে পৌছেঁ, তারপর তাতে হুকুম লাগাবেন। উলামায়ে

কেরামের রাহনুমায়ী নিবেন। শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মূল বিষয় জানবেন। কিতাবাদি অধ্যয়ন করবেন। অত:পর কোন ফলাফলে পৌছাঁবেন। এটা আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, তিনি এই সফরে আমাকে সাথে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

মাদরাসার খসড়া

আধুনিক পশ্চিমা শাসনব্যবস্থার জীবনধারা অস্বীকার করার পর এখন এই চিন্তা এসে ভিড় করল যে, এই ভাবনাকে কিভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায়? সমাজের মাঝে পরিবর্তন আসবে কিভাবে? অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করার সময়ে এই কথাও ভালভাবে বুঝে এসেছিল যে, উম্মাতের সমস্যাবলীর সমাধানও আহলুল হল্ল ওয়াল আকদ তথা সমাজে বসবাসরতদের মাঝে যারা প্রভাব ও ক্ষমতা রাখে এমন সৎ ও ভাল সদস্যরাই করবেন। আর আহলুল হল্ল ওয়াল আকদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলেন উলামায়ে কেরাম। তাঁরাই আম্বিয়াদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই কুরআন-সুন্নাতের জ্ঞান বাহক। তাঁদের কাছেই সমাজ পরিবর্তনের গুপ্তধন আছে। তাঁরাই উম্মাতের আশা-ভরসাস্থল।

গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধানের পর মনে হল যে, প্রত্যেক এলাকার কতিপয় উলামাদের সাথে সম্পর্ক করা উচিত। যাদের সামনে বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক শাসনব্যবস্থার স্বরুপ উন্মোচন করা হবে এবং তাঁদেরকে প্রস্তুত করা হবে যে, তাঁরা তাতে খুব গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করে আমাদেরকে জানাবে যে, এই শাসনব্যবস্থা কি ইসলামী হতে পারে!? এখন যদি তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারে যে, তা কোনভাবেই ইসলামী হতে পারে না, তাহলে তো এই শাসনব্যবস্থার বিকল্প খুজঁতে হবে এবং প্রত্যেক লেনদেনের ক্ষেত্রে “সঠিক ইসলামী ভিত্তি” এর উপর মজবুতভাবে আমল করতে হবে। সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের এক বিশেষ বাক্য ছিল, যা বলতে বলতে তিনি নিজ

হাত দ্বারা নিশ্চয়তার ইশারা করতেন। আর তা হল “ইসলামের ব্যাপারে কোন প্রকারের আপোস-রফা করবে না বরং وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ ‘তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না’ এমন গুণওয়ালা হয়ে যাও”।

তিনি এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার নিমিত্তে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিলেন। সকাল-সন্ধ্যা এই চিন্তায় বিভোর থাকতেন যে, তাঁর পাঠ্যসূচি কি রকম হবে? তাঁর উস্তাদ কোথায় থেকে পাওয়া যাবে? তালিবুল ইলমদেরকে কিভাবে নির্বাচন করা হবে? তা কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে? তাঁর ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে? ইত্যাদি...! দীর্ঘ সময় নিয়ে তার খসরা/চিত্র তৈরী করলেন। তিনি বিস্তারিত এক পাঠ্যসূচিও বিন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমাকে পাননি। অন্যান্য সাথীরা এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করল। মাদরাসা চালানোর জন্য তিনি সামর্থ অনুযায়ী আহলে ইলম ও জনহিতৈষীবৃন্দের সাথে উপদেশমূলক খুব পরামর্শ করলেন। জামিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার কয়েক বছর পূর্বেই একটি দ্বীনি মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও ম্যানেজমেন্ট এই উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন করেছিলেন। পাশাপাশি উলামায়ে কেরাম, আসাতিজা ও সামর্থবান ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

তাঁর চিন্তাভাবনায় ভবিষ্যতে মাদরাসার দুটি শাখা খোলার পরিকল্পনা ছিল।

এক. ফারেগীন উলামাদের জন্য। যার মাধ্যমে উম্মাতে মুসলিমাকে আগত নতুন পরিস্থিতি ও তাতে করণীয় কি? এ সম্পর্কে ধারণা দিতে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা হবে।

দুই. সাধারণ তালিবুল ইলমদের জন্য। যার মাধ্যমে দরসে নেযামীর সাথে সাথে তালিবুল ইলমদেরকে আধুনিক দুনিয়ার বাস্তবতা এবং তার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সংবেদনশীলতার সাথে শিক্ষা দেওয়া হবে।

এ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য

এই সবকিছু প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য তিনি শুরু থেকেই একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। যদি এই সময়ের ভিতরে সফল হতে পারেন তো ঠিক আছে নতুবা তিনি পুনরায় জিহাদের ময়দানে ফিরে যাবেন। কেনো? এই জন্য যে, তাঁর এ সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা জিহাদের জন্যই তো ছিল, যাতে জিহাদের ফলাফল লাভ করা যায়। তাঁর এই আমলের দৃষ্টান্ত এমন ছিল যে, কোন জায়গায় কিছু লোক নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গেল, কিন্তু মসজিদ থেকে বের হতেই সামনের বাজারে পাপাচার ও অবাধ্যতা ইবাদতের মাধ্যমে তাদের অর্জিত আমল ও তাকওয়াকে নষ্ট করে দিল।

এখন যদি কেউ ভাবে যে, নামাযের উদ্দেশ্যাবলী তো সেই সময়েই পূর্ণ হবে, যখন বাজারের পাপাচার ও অবাধ্যতা সমূলে নিঃশেষ করে ফেলা হবে। আর সেজন্য সে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিল। কিন্তু এ সময়ের মাঝেই সে আযানের আওয়াজ শুনতে পেল, তখন কি তাঁর জন্য জায়েজ হবে যে, সে নামায পড়ার পরিবর্তে বাজারের সংশোধনে নিয়োজিত হবে!?

ব্যস! এভাবেই তিনি নিজের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, যদি এই সময়ের মধ্যে সমাজের মাঝে ঐ কাজ করতে না পারেন যা জিহাদের জন্য জরুরী, তাহলে তিনি জিহাদের আহবানে লাব্বাইক বলে জিহাদের ময়দানের দিকে বের হয়ে যাবেন, যেন দুনিয়া থেকে কুফরী শাসনব্যবস্থা সমূলে উপড়ে ফেলতে পারেন। কেননা, জিহাদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হবে না। আর এ বিষয়টি তো কোন মনুষ্য চিন্তা-ভাবনা থেকে নয় বরং জিহাদ তো আল্লাহ তায়ালার এক চিরন্তন হুকুম।

মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেচেঁ থাকার জন্য বিভিন্ন উপকরণ রেখেছেন। এ জন্য মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই ইলমে শরীয়তের এই সংজ্ঞা বার বার বলতেন: “ইলমে শরীয়ত ওই ইলমকে বলে যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বিধি-

বিধানের ব্যাপারে আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়"। সুতরাং যদি আল্লাহ তায়ালা নামাযের আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে নামাযের দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আর তা কে, কিভাবে, কখন আদায় করবে? এই বিষয়গুলি শরীয়ত সুস্পষ্ট করে। এই রকম জিহাদের ব্যাপারেও শরীয়ত সব কিছু সুস্পষ্ট করে।

যেহেতু মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ তায়ালার হুকুম বাস্তবায়ন। এই জন্য কাশ্মির জিহাদ থেকে ফিরার পর থেকে নিয়ে জামিয়া থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী বিষয়াদি, বিশেষকরে জিহাদের ব্যাপারে বুনিয়াদি কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে লাগলেন। আমার খুব ভাল করেই মনে আছে যে, তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর কিতাব 'কিতাবুস সিয়ার' এর ব্যাখ্যাকে নিজ জামাতের ছাত্রদের সাথে মুযাকারার পদ্ধদিতে পড়তেন এবং মাসআলার মর্ম উদ্ধারে খুব চিন্তা-ভাবনা করতেন। আর জিহাদ তো আল্লাহ তায়ালার হুকুম, তাহলে তা থেকে কিভাবে বিরত থাকা যেতে পারে! মাদরাসার যে খসড়া তিনি পেশ করে ছিলেন, তা কখনো জিহাদের বিপরীতে ছিল না। বরং তা জিহাদের জন্য সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিল। অথবা বলা হবে যে, তা জিহাদের হুকুম বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া ছিল। কেননা, এটা তো তাঁর মস্তিস্কে বদ্ধমূল ছিল যে, শরীয়তে জিহাদ শব্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগস্থল হল কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধ করা। আর এটা তো কোন ভাবেই সম্ভব নয় যে, মূল জিহাদকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার একটি শাখার জন্য মুলতবি রাখা হবে!

জিহাদও শরীয়তের অনুগামী

যখন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল এবং তা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন তিনি ময়দানের জিহাদের অভিমুখী হলেন। কিন্তু এবার তা কোন তানযীমের/সংগঠনের অধীনে নয়, যা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠুরতায় আটকা

পড়ে আছে। বরং তাগুতী শাসনব্যবস্থার বন্দীদশা থেকে স্বাধীন হয়ে, তাদেরকে খতম করার এবং তাদের জায়গায় আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য তিনি সর্বদা এ কথার পুনরাবৃত্তি করতেন: "এবার তো আমাদের জিহাদ করতে হবে কিন্তু (তা যথাযথ পন্থায় হতে হবে) অর্থাৎ ভালভাবে যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। যদি কোথাও শরীয়তের বিপরীত কোন কাজ হয়, তাহলে আমরা এমন জিহাদকে সমর্থন করি না। কেননা, আমাদের শরীয়ত প্রত্যেক তানযীম/সংগঠন ও আমীরের ইমারত থেকে বেশী প্রিয়। আল্লাহর শরীয়ত সকল আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান থেকে বহু উর্ধ্বে। যদি যাচাই-বাচাই করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্ধ অনুসরণও করা যাবে না। যে উদ্দেশ্যে বাইয়াত ও শপথ নেওয়া হয়, যদি সে উদ্দেশ্যই পুরা না হয়, তাহলে এই বাইয়াত ও শপথের কি অবস্থা হতে পারে?"

আর মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, জিহাদের ভূমিতে তাঁর সম্পর্ক এমন এক গ্রুপের সাথে হয়েছে, যারা তাঁর চেয়েও বেশী তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত ছিল। সত্য পথের অভিযাত্রী এই অস্থির রুহের স্বীয় মানসিকতা সম্পন্ন নতুন সাথী মিলে গেল। প্রথমদিকে তাঁর আরব মুজাহিদদের ব্যাপারে কিছু সংশয় ছিল যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাড়াবড়ি আছে অথবা তাঁরা তাঁদের মতবাদে গোড়ামীর শিকার অথবা আরব হওয়ার কারণে অহংকারে লিপ্ত ? কিন্তু তিনি যখন শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুমুল্লাহদের মত আল কায়েদার উলামা এবং অন্যান্য নেতাদের সংস্পর্শে আসলেন, "**তখন তাঁদেরকে খুব মধ্যপন্থী ও খোদাভীতিসম্পন্ন পেলেন। কোন বিষয়ে ফায়সালা দিতে তাড়াহুড়া করেন না। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দেন 'জানা নেই'। কোন মতাদর্শের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের সাথে তাঁদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই আবার দুশমনিও নেই।**" যখন তাঁদের ব্যাপারে তাঁর খুব ইতমিনান হাসিল হয়, তখন তাঁদের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতার চুক্তি করেন।

কিন্তু তিনি জিহাদের ময়দানেও ইলমে শরীয়ত থেকে অমনোযোগী থাকতেন না। অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবকে ভালভাবে অধ্যয়ন করে শেষ না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরণের মন্তব্য করতেন না। শুধু একবার অধ্যয়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। এ সময়ের মাঝেই তিনি একদিন আমাকে বললেন: “উম্মাতে মুসলিমার মাঝে প্রচলিত অন্যান্য চিন্তাধারা ও মতবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা জরুরী। তাই আসুন এক কাজ করি- আপনি অমুক বিষয়টি অধ্যয়ন করুন আর আমি অন্য একটা বিষয় অধ্যয়ন করি। তারপর আমরা একে অপরকে নিজেদের অধ্যয়নের সার-সংক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত করি। তাহলে অল্প সময়ের মাঝে আমাদের অধিক অধ্যয়ন হয়ে যাবে”। এরই ফলশ্রুতিতে আমি গামেদি মতবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা শুরু করে দিলাম। আর তিনি হিযবুত তাহরীরের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম তাকী উদ্দীন নাবহানী রহ. এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করা শুরু করে দিলেন। তাছাড়া বুনিয়াদী কিতাবাদির মাঝে উসুলে ফিকহের একটি কিতাবও নির্বাচন করলাম। আমরা দু‘জন এক অংশ করে পড়ে নিতাম অত:পর প্রত্যেকেই কি বুঝেছি তা বর্ণনা করতাম। আর যদি কোথাও কারো ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়, তাহলে পরস্পর আলোচনা করে সমাধান করে নিতাম।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের রাজধানী ওয়ানায় অবস্থান কালে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ড্রোন হামলা প্রতিহত করার জন্য হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর সুন্নাত খন্দক খননের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু এত কঠিন মেহনত করা সত্ত্বেও কোন না কোন কিতাব অধ্যয়ন করা অব্যাহত ছিল। ইলমের সাথে এমন নিমগ্নতা খুব কম সাথীদের মাঝেই দেখতে পেয়েছি!

সংশোধনের প্রবল ইচ্ছা ও সত্যকথন

পশতুন সম্প্রদায়ের রীতি-রেওয়াজের মাঝে পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদেরকে কোন অংশ দেওয়া হত না, অথচ তা আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট বিধান। তিনি বলতেন: "আমি পিতার ইন্তেকালের পর ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের সময় শুধু ভাইদের অংশের সাথে বোনদের অংশও দিতে হবে এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত থাকিনি বরং তা বাস্তবায়নে সরাসরি ব্যবস্থা নিয়েছি। এমনকি গ্রামের মসজিদে পর্যন্ত ঘোষনা করে দিয়েছি"। তিনি আরো বলেন: "এর ফলশ্রুতিতে গ্রামের কতিপয় অন্যান্য লোকও তাঁদের বোনদের অংশ দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন"।

এমনিভাবে শেষবার জিহাদের বের হওয়ার পূর্বে তিনি স্বীয় প্রিয় নিকটাত্মীয়, গ্রামবাসী, বন্ধু-বান্ধব ও সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরামকে সর্বোতভাবে প্রকাশ্যে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। অথচ সাম্প্রতিককালে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং কাশ্মির জিহাদের থেকেও বেশী সঙ্গীন বা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাড়িঁয়েছে।

সংশোধনের এই পদ্ধতি শুধু দলবদ্ধভবে ছিল না বরং ব্যক্তি পর্যায়েও সংশোধনের ধারা বজায় ছিল। এ ব্যাপারে আমি নিজে সাক্ষী। একবার তিনি আমার এখানে এসেছিলেন, এরই মধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। তখন আমরা নামায আদায়ের নিমিত্তে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলাম। যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনি আমায় বললেন যে, তুমি নিজ সন্তানকে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাও না কেন? অন্য এক সময় তাঁর মনে হল যে, আমি আমার মাতা-পিতাকে সেই পরিমাণ আদব-সম্মান করি না যে পরিমাণ করা দরকার। কিন্তু তাৎক্ষনিক আমাকে কিছু বললেন না। বরং কিছু সময় পরে যখন সুযোগ হল, তখন আছরের নামাযের পর তালীমের মাঝে আদাবুল বুখারীর অধ্যায়গুলো পড়লেন। যার মধ্যে মাতা-পিতার আদব সংক্রান্ত বর্ণনা ছিল। তাঁর এই আচরণ আমার উপর খুব গভীর প্রভাব ফেলেছে।

জিহাদের ময়দানেও সংশোধনের এই ধারা অব্যাহত ছিল। জিহাদের ময়দানে আমি নবাগত হওয়ার কারণে কিছু হুকুম-আহকাম আমার জানা ছিল না। তো তিনি আমাকে সরাসরি কিছু না বলে দরসের ফাঁকে ফাঁকে খুব আরামের সাথে সেই সমস্ত হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে দিতেন। আমার জানা ছিল যে, এ গুলি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। কিন্তু কোন ধরনের সম্মানহানি করা ব্যতীত।

সত্য সব সময় তাঁর নিকট অতিশয় প্রিয় ছিল। একবার উল্লেখিত মাদরাসার ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে কোন ব্যবসায় টাকা খাটানোর এবং তা থেকে লাভবান হওয়া সংক্রান্ত কথা-বার্তা চলছিল। যখন তিনি বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাতে সুদের মিশ্রণ থাকতে পারে। তিনি আমাকে বললেন: সেখানে টাকা খাটানো উচিত হবে না। এমনিভাবে বর্তমানে প্রচলিত কৃষি সংক্রান্ত এক মাসআলার ব্যাপারে আমার পিতাকে সুনিশ্চিতভাবে বলে দিলেন যে, তা আমাদের উলামায়ে কেরামের নিকট সহীহ নয়। অথচ আমার পিতা থেকে তাঁর আশা ছিল যে, তিনি মাদরাসায় সহযোগিতা করবেন। সত্যকথনের ক্ষেত্রে আমার বন্ধুত্ব বা কারো আর্থিক সহায়তার আশা তাঁকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারত না।

ইলমের সনদ বা তাঁর উপর আমল

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই সনদ পাওয়ার জন্য জামিয়ায় ভর্তি হননি বা সনদের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন: বন্ধু-বান্ধব ও আসাতিয়ায়ে কেরাম গতানুগতিক শিক্ষা শেষ করার জন্য আমার পিছনে লেগে থাকতেন। কিন্তু আমার এতে কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম “আন্তর্জাতিক আইন ও শরীয়তে শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক কর্ম” ছিল। তিনি আরো বলতেন “আন্তর্জাতিক আইন শরীয়তের ভাল

মুকাবিলা কি করতে পারবে! তা তো আমার দৃষ্টিতেই কোন গুরুত্ব রাখে না। আসল তো হল ইসলাম।" আরেকবার এ কথা বললেন যে, "আমি আমার প্রবন্ধে পুরো কথা লিখতে পারিনি, যদি লিখতাম তাহলে তো সে প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য-ই হত না। আমার দৃষ্টিতে আধুনিক শাসনব্যবস্থাকে যারা মেনে নিয়েছে তারা শরীয়তের অবস্থানকে হজম করতে পারবে না"। তারপর প্রবন্ধ পেশ করার পূর্বে আরো একবার বললেন যে, "আমার ইতমিনান হচ্ছে না, আমি কি এ প্রবন্ধ পেশ করা ছেড়ে দিব না?" আমি পীড়া দিতে লাগলাম। এটা ওই সময়ের কথা যখন তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টারত ছিলেন। যেহেতু এতটুকু সময় ছিল যে, তিনি প্রবন্ধ লিখবেন, তাই তিনি লিখলেন। নতুবা তা ঐ রকম হত, যে রকম তিনি আমার সাথে করেছেন।

তারপর আমি জিহাদের ময়দানে কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে আসলাম এবং দুনিয়াবী কাজ-কারবারে মশগুল হয়ে গেলাম। কিছুকাল পর তিনিও ফিরে আসলেন এবং আমাকে তৎপর করতে লাগলেন যে, জিহাদের জন্য আবার কখন বের হব? তখন আমি বললাম যে, আমার চিন্তাভাবনায় মুয়ামালা দুরস্ত করার জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন ছিল, তার থেকে বেশী লেগে গেছে। পাশাপাশি আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম: "কিন্তু খুশীর কথা হল যে, আমি কতক প্রবন্ধে প্রথম হয়েছিলাম"। তিনি এ কথা শুনার পর মুবারকবাদ দেওয়া তো দূরে থাক, বরং স্বীয় চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। যার মাধ্যমে আমার প্রতি সুস্পষ্ট বার্তা ছিল যে, উম্মাতে মুসলিমাহ জ্বলে-পুড়ে মরছে, আল্লাহ তায়ালা হুকুম বরবাদ হচ্ছে আর তুমি স্বীয় সনদের উপর খুশী হচ্ছো! এটা কোন ধরনের ইসলামী ইলম?

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই-ই আমাকে সর্বপ্রথম জিহাদের ময়দানের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জামিয়াতে ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য ভর্তি হয়ে ছিলেন। ব্যস! আল্লাহর মেহেরবানী ছিল যে, তাঁর বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দ্বীনের পথে চলার

তাওফিক দিয়েছেন। আর সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের মত যোগ্য সাথী দিয়েছিলেন। যিনি আমাকে দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের রাস্তা দেখিয়েছেন। যিনি মানসিক পর্যায় থেকে শুরু করে আমলী পর্যায় পৌঁছা পর্যন্ত আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন।

উত্তম গুণাবলী

তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন গুরত্ব ছিল না। বাহ্যিকভাবেও না আভ্যন্তরিণভাবেও না। লৌকিকতা থেকে দূরে থাকতেন, সাদা কাপড় পরিধান করতেন, সাদাসিদা খাবার খেতেন ও অল্পতুষ্টে জীবন-যাপন করতেন। তিনি যেন এই দুনিয়ার মাখলুক ছিলেন না, বরং দুনিয়াতে থাকতেন ঠিক কিন্তু তাঁর রুহ যেন স্বীয় পূর্বসূরীদের সাথে ভ্রমন করত।
তাঁর ছোট ভাইয়ের মাঝেও অনেক উত্তম গুণাবলী ছিল, সে জিহাদের জন্য বের হয়েছিল এবং খুব দ্রুত শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই ভাই রাতে সকল সাথীদের থেকে আগে জেগে তাঁর কাপড় ধুয়ে দিতেন। তাঁরা দুই ভাই-ই খেদমতে অগ্রগামী ছিলেন।
মহান আল্লাহ তায়ালা তার মাতা-পিতার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, যারা তাঁদের সন্তানদেরকে এমন তারবিয়াত করেছেন। আর এই বংশ আমাদের জন্য অনুসরণীয় এক বাস্তব নমুনাই বটে।

শাহাদাত

সাঈদুল্লাহ ভাই ওয়ানা থাকতেই পাকিস্তানি-আমেরিকিদের ড্রোন হামলার নিশান হয়েছিলেন। কতক সাথী সেখানেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, যার মধ্যে সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের ছোট ভাইও শামিল ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মতই উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং খেদমতে অগ্রগামী থাকতেন। যখন সাঈদুল্লাহ ভাই মারাত্মক আহত হলেন, তখন তাঁর মাথায়ও প্রচন্ড আঘাত লেগে ছিল এবং এক পা হাটুঁর উপর থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। কিন্তু শারিরীক

কষ্ট থেকেও তাঁর বেশী পেরেশানী ছিল যে, তিনি অন্যান্য সাথীদের মত কেন শহীদ হতে পারলেন না! পিছনে কেন রয়ে গেলেন!! তারপর বলতেন: "আসলে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং পবিত্র জিনিসকে তিনি গ্রহণ করেন। আমার মধ্যে সে সমস্ত বৈশিষ্ট নেই"। এই অক্ষমতা ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্টির অবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শহীদদের কাতারে শামিল করে নিন এবং জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা তাকে দান করুন। .... আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

শেষ কথা

এই সংক্ষিপ্ত ভাঙ্গাচোরা শব্দাবলী ও দূর্বল স্মৃতি শক্তি দিয়ে সাঈদুল্লাহ ভাইয়ের জীবনবৃত্তান্তের হক আদায় করতে পারবো না। তবে আমি দুয়া করি তিনি যেমন জীবিত অবস্থায় আমাদের জন্য বাতিস্বরুপ ছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর শাহাদাতের পরেও তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতিচিহ্ন অন্যদের জন্য চলার পথের মশাল হোক। সেই পথ যার শেষ গন্তব্য দুনিয়ার মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ও পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা। ... আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।